৬ বছরের বাচ্চাটিকে এমনিতে দেখে বোঝার উপায় নেই যে গত ১৫ মাস ধরে লিউকিমিয়া নামক দানব রোগটি তিলে তিলে ওর দিকে ভয়াল মৃত্যুর থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে। বোঝা যায় যখন ওর শরীরের রক্তবিন্দুগুলি নিঃশেষ হয়ে প্রচন্ড জ্বরের ঘোরে ওর মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ে। বাচ্চাটির নাম সমীর দত্ত। পিতা স্বপন দত্ত। গ্রাম ঝিনাইডাঙা, পো নীলকুঠি, জেলা কোচবিহার। স্বপনবাবু গ্রামের একজন নিতান্তই দরিদ্র কৃষক। ছেলের চিকিৎসার খরচ চালাতে প্রথমে নিজের দু-বিঘা জমি বিক্রি করেছেন। তারপর গ্রামের আর পাঁচজনের আর্থিক সাহায্যে যতদূর হয় চেষ্টা চালিয়েছেন মৃত্যুর মুখ থেকে ছেলেকে রক্ষা করতে। সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় নি। বর্তমানে যে ওষুধটি ওর শরীরে প্রয়োগ করা হচ্ছে ৩ মাসে ৪টে করে, তার প্রতিটির বর্তমান মূল্য ১৬৫০ টাকা। সাহায্যের জন্য যোগাযোগ, ৯৪৩৪৬৮৭৩৪৭ (সুরজিত পন্ডিত)।

Vol 1 Issue 9 1 November 2009 Rs. 2 http://sites.google.com/site/songbadmanthan

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যা ১ নভেম্বর ২০০৯ রবিবার ২ টাকা

• চলে গেলেন আব্দুল জব্বার পৃ ২ • কৃষিজমি ও জলাজমি সঙ্কটে পৃ ২ • পাহাড়পুর পৃ ৩ • ঠিকা খনিশ্রমিক পৃ ৩ • ভুটান ভ্রমণ পৃ ৪ • রাস্তা নেই পৃ ৪

ঢাকের বোলে মন খারাপের সুর

গতকাল জগদ্ধাত্রী পুজো মিটে গেছে। আজ গাঁয়ে ফিরে যাওয়ার আগে ঢাক বাজিয়ে পাড়ার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করছে ওরা দুজন — প্রদীপ আর বুদ্ধদেব দাস। বীরভূমের লাভপুর থানার কাপসুন্দি গ্রামে ওদের বাস। গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় কয়েক ঘর ঢাকি রয়েছে। ফি-বছর এসময়টা ওরা ঢাক কাঁধে চলে আসে শহরে। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজোর প্যান্ডেলে ঢাক বাজিয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকা আয় হয়। কিন্তু সে টাকায় সারাবছর পেট চলে না। দক্ষিণপাড়ায় কারোরই চাষের জমি নেই, বসতভিটেটুকু আছে। ওরা অন্যের জমিতে চাষ করে। তবে এবছর বর্ষার জলের অভাবে আমনের চাষ হয়নি। নবমীর দিন যখন কলকাতায় ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এল, ওরা গাঁয়ে ফোন করে শুনল, সেখানে বৃষ্টি হয়নি। যারা লাগিয়েছিল, সেই ধানগাছ মাঠেই শুকিয়ে মরে গেছে। এখন ওরা অপেক্ষায় রয়েছে পরের বছর গ্রীষ্মের বোরোধান চাষের জন্য। ঢাক বাজিয়ে যা দুটো পয়সা আয় হল, ওটা তখন কাজে লাগবে। যদি অর্ধেক ফসলের ভাগে জমি নিতে হয়, অর্ধেক জোড়ামাটি (সার ইত্যাদির) খরচ দিতে হবে। জমির মালিক যদি জোড়ামাটির পুরো খরচ জোগায়, তবে দু'ভাগ ফসল তাকে দিতে হবে, একভাগ থাকবে যে গতর দেবে তার। আমন আর বোরো দুটো চাষ করতে পারলে সারাবছরের সংসারের খোরাকটা হয়ে যেত। কিন্তু এবছর আলু, সবজিও তেমন হয়নি। বাজার থেকে সব কিনে খেতে হচ্ছে। এসব কথা বলতে বলতেই ওদের ঢাকে কাঠি পড়ে। এ ক'দিন পুজো মাতিয়ে আজ ওদের ঘরে ফেরার তাড়া। ঢাকের বোলেও যেন কেমন মন খারাপ করা সুর। ছবি ও প্রতিবেদন জিতেন নন্দী। ২৯ অক্টোবর।

চাষির দায়িত্ব বাজারে চালের যোগান দেওয়া, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে আমন ধানও মার খাচ্ছে

বশিরুদ্দিন, ২৮ অক্টোবর, বীরভূম •

• বৃষ্টি না হওয়ায় খড়ে কীটনাশকের প্রভাব রয়ে যাচ্ছে।

• ক্যানেলে প্রচুর জল ছাড়া হলেও খেত পর্যন্ত তা গিয়ে পৌঁছচ্ছে না, নালা দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ছে।

আলুতে মার খেলেও বোরো চাষে পুষিয়ে গিয়েছিল কিছুটা। তবু এ বছর বর্ষার খামখেয়ালিপনায় আবার মার খেতে চলেছে চাষি। আমন চাষে প্রচুর জল দরকার, বিশেষ করে গাছের গোড়ায় সবসময় জল থাকা চাই। ধান পাকার আগে পর্যন্ত। কিন্তু সেরকম সুযোগ এ বছর হলই না। রোপনের পর থেকে মাটি শুকিয়ে ধান গাছ বেড়েছে। সেপ্টেম্বরে যা একটু ভালো রকম জল পেয়েছে ধান গাছের গোড়া। এ বছর ধান এমনিতে নামলা (দেরিতে চাষ হয়েছে)। এবং ধান পাকতে কার্ত্তিক মাস (নভেম্বরের অর্ধেক) পেরিয়ে যাবে। ফলে জলের অভাব ভীষণ দেখা দিয়েছে।

চাষি সালামের কথায়, 'আউশ ধান তো বেশ হয়েছে, কিন্তু আমন ধানের ফলন চরম মার খাবে পানির জন্য'। বীরভূমের ক্যানেলগুলোতে প্রচুর জল ছাড়া হলেও খেত পর্যন্ত জল গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। তাতে ক্যানেল কোম্পানির কোনও সাড়া নেই। পারুল থানা এলাকায় ক্যানেলে এত জল যে ধানজমির গলায় গলায় জল। তা থোর থাকা ধান গাছের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এই বাড়তি জল নালা দিয়ে কোপাই নদীতে গিয়ে পড়ছে, যা কোনও কাজেই লাগছে না। অন্যদিকে থুপসাড়া পঞ্চায়েত বা নোয়ানগর কোডা পঞ্চায়েত এলাকার পর থেকে ক্যানেলের জল একফোঁটাও গিয়ে পৌঁছচ্ছে না। তার আগেই নাল দিয়ে আগের অঞ্চলের লোকেরা আটকে দিয়েছে। অথচ এই এলাকা কৃষিকাজে সমৃদ্ধ, ফলে চাষিরা পড়েছে মহা ফাঁপড়ে। যাদের সেচের ব্যবস্থা আছে, যেমন সাবমার্সিবল বা শ্যালো আছে তারা সেচ করছে। যাদের নেই, তারা বিঘাপ্রতি ২টি সেচের জন্য একমন করে ধান দিতে বাধ্য হচ্ছে। যে এক মন ধানের দাম প্রায় তিনশ'রও বেশি। তাও সব জমিতে জলসেচ করা যাবে না। ডাঙাদহ জমির ধান মারা যাবে।

শেখ আলিম বলেন, 'সেই ভাদ্র মাস থেকে ক্যানেলে জল নেই, অথচ খাজনা দিতে হবে। আবার আমাদের দেশের ব্যবস্থাটাই এমন। সমবন্টন নেই। ক্যানেলের জলও তার প্রমাণ। সরকারি লোকজন, যাদের দেখার কথা ক্যানেলের জল সর্বত্র ঠিকমতো যাচ্ছে কি না, তাদেরও দেখা নেই। এইভাবে একটি দেশ চলতে পারে না। সব জমির ধান উদ্ধার হবে না।'

আবার খাল বিল পুকুরে যে জল আছে তা-ও সবজি চাষে কাজে লাগে। এখন যদি ধান সেচ করতে এসব জল ফুরিয়ে যায় তাহলে সবজি চাষ হবে কী করে? সে চিন্তাও চাষিদের ভাবিয়ে তুলেছে। আবার ক্যানেলের জল পাওয়ার জন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হবে, তাদের জানা নেই। তাই বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। ব্যস্ত আলিম, সালামদের দায়িত্ব বাজারে চালের যোগান দেওয়া। তাই না?

কিন্তু সমস্যা আরও দেখা যাচ্ছে। ধানে পোকার আক্রমণ প্রবল। ঘন ঘন স্প্রে করতে হচ্ছে। তাও ধান গাছের রঙ হলুদ হচ্ছে, পোকার আক্রমণে। বৃষ্টি না হওয়ায় ধানগাছে কীটনাশকের প্রতিক্রিয়াগুলো থেকে যাচ্ছে এবং এই খড় খেলে গরুর পাতলা পায়খানা হবে, ফলে গরু মারাও যেতে পারে। এই আশঙ্কাও চাষিদের খুবই ভাবিয়ে তুলেছে।

রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটির দাবিসনদ
২৫ অক্টোবর রাজারহাট থানায় পেশ করা হল

শমীক সরকার, রাজারহাট, ২৫ অক্টোবর •

ওই দিনই সকালে ছাপনা গ্রামে কৃষকদের থেকে অধিগৃহীত জমিতে হাই টেনশন লাইনের খুঁটি পুঁততে এসেছিলেন বিদ্যুৎ দফতরের আধিকারিকরা, পুলিশ নিয়ে। ফের একবার গ্রামবাসীদের অবরোধে ফিরে যেতে হয় তাদের। এবার এই অবরোধে সামিল হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে ২৫ অক্টোবর রাজারহাট থানায় একটি বিক্ষোভ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় রাজারহাট জমি বাঁচাও কমিটির আয়োজনে। এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভূমি সংস্কার বিশেষজ্ঞ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজারহাটের বিস্তীর্ণ জমি চোরাপথে কিনে নিয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্যোগ। ভূমি দপ্তরের বদান্যতায় এইসব জমি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রেজিস্ট্রি ও মিউটেশন হয়ে গেছে। সেই জমিগুলিকে তার প্রকৃত মালিক যে চাষি, তার হাতে ফিরে পেতে বর্তমান আইনে প্রায় ১৫ বছর লেগে যাবে। তাই এইসব জমি যাতে তার প্রকৃত মালিকের কাছে দ্রুত ফিরে যেতে পারে, তার জন্য রাজ্য সরকারকে আইন করতে হবে। জমি বাঁচাও কমিটির ১৫ দফা দাবি সনদের সঙ্গে এই দাবিটিকেও জুড়ে দিতে বলেন তিনি। জমি বাঁচাও কমিটির অন্যান্য দাবিগুলি ছিল,

• রাজারহাটে নতুন করে জমি অধিগ্রহণ করা চলবে না।

• যে সমস্ত অনিচ্ছুক চাষিরা শুনানিতে অংশগ্রহণ করেনি বা টাকা পায়নি, সেইসব চাষির জমি থেকে L.A./4 (ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট, সেকশন 8) তুলে নিতে হবে।

• বেদিক কাণ্ড, অলিভ গার্ডেন, বেআইনি পুকুর ভরাট কাণ্ডে যারা যুক্ত আছে, সরেজমিনে নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিতকরণ করতে হবে এবং উপযুক্ত আইনের ব্যবস্থা করতে হবে।

• বাগজোলা খালের দক্ষিণ দিক দিয়ে সরকারি অধিগৃহীত জমির ওপর দিয়ে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুতের লাইন নিয়ে যেতে হবে।

• সুকৌশলে হিডকোর দালাল মারফত বাগজোলা খালের উত্তর দিকের অনিচ্ছুক চাষিদের ফার্স্ট প্লট জমি বেশি দাম দিয়ে কিনে আন্দোলনকারী কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জঘন্য চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।

• পাথরঘাটা অঞ্চলের যেসব মৌজার কাগজপত্র ডি.এম. অফিসে জমা থাকার জন্য সাধারণ মানুষ মামলা করতে পারছে না, অবিলম্বে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

• পাথরঘাটার বাজেপাড়ার ব্রিজ থেকে নতুন পুকুর ব্রিজ পর্যন্ত সরকারি ম্যাপ তৈরি করে চাষিদের বর্তমান মূল্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

• নতুন শহরের মধ্যে যেসব ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে উঠছে বা উঠবে, সেখানে মন্ত্রীদের পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক জমিদাতা, বর্গা কৃষক, প্রান্তিক কৃষক এবং বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন ও স্থায়ী ব্যবসা করার সুযোগ দিতে হবে।

• অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত পূর্বক সিন্ডিকেটে দলীয়করণ দূর করে প্রকৃত জমিহারা গরিব চাষি, জনমজুর, বর্গাদার ও পাট্টাদারদের সদস্য করতে হবে।

এরপর তিনের পাতায়

দশ বছরে পা দিল
মণিপুরের মেয়ে শর্মিলার অনশন

গত বছর থেকে চালু হওয়া কালা আইন উয়াপা ২০০৮-এর কবলে পড়ে আন্দোলনের কর্মীদের হাজতবাস তো আমরা দেখছি। এর চেয়েও এক ভয়ঙ্কর কালা আইন 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৫৮' বা AFSPA চালু রয়েছে মণিপুরসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। যার বলে সেখানে মোতায়েন মিলিটারিরা সমন ছাড়া গ্রেপ্তার করতে পারে যে কাউকে, সন্দেহের বশে কাউকে খুন করতে পারে...। এই আইনের জোরে মণিপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনী হত্যা, অত্যাচার, অপহরণ, ধর্ষণ সবকিছুই চালিয়ে যাচ্ছে।

২০০০ সালের ২ নভেম্বর মণিপুরের মালোমে সেনাবাহিনী দশজন সাধারণ মানুষকে হত্যার পরে এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনশনে বসেন মণিপুরী তরুণ কবি ইরম শর্মিলা চানু। ৬ নভেম্বর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শর্মিলা একফোঁটা জলও নিয়ে খাননি। ২১ নভেম্বর ২০০০ থেকে তার নাকে প্লাস্টিক নল ঢুকিয়ে তাকে জোর করে তরল খাদ্য খাওয়ানো চলছে, সেই সাথে চলছে তাঁর হাজতবাস। প্রতি বছর তাঁকে ছাড়া হয়, ফের একবার কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার করার জন্য।

শর্মিলার অনশনের সংহতিতে ২০০৮ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে তাঁর সঙ্গীসাথীরা রিলে অনশন শুরু করেন। এবং উদ্যোগ নেন, শর্মিলার অনশনের দশম বর্ষের সূচনাকে 'আশা, ন্যায় এবং শান্তির উৎসব' হিসেবে পালন করার। এই উপলক্ষ্যে সারা দেশে শর্মিলার অনশনের সমর্থনে আয়োজিত হচ্ছে প্রতিবাদ, প্রতীকী অনশন, মানবাধিকারের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী প্রভৃতি উদ্যোগ, ২ নভেম্বর থেকে ৬ নভেম্বর ২০০৯ — এই সময়কাল জুড়ে। সংবাদমন্থন এই উদ্যোগের সাথে সংহতি জ্ঞাপন করছে।

সেইদিন থেকে একটা ভয় জাপটে ধরেছে গোটা গ্রামকে...

২৭ অক্টোবর জনসাধারণের কমিটির বনধের মধ্যে বনধ সমর্থক একটি মিছিল ভুবনেশ্বরগামী রাজধানী এক্সপ্রেসকে অবরোধ করে, ঝাড়গ্রাম লাগোয়া বাঁশতলা হল্ট-এ। ৩০ অক্টোবর ভোর ৬টার লোকালে সেই বাঁশতলা হল্ট-এ নেমে পড়েন ঝাড়গ্রামের দুই যুবক। দু'পা হেঁটেও আসেন আশেপাশের গ্রামগুলিতে। লিখেছেন অমিতাভ সাহা •

পাতার ফাঁক দিয়ে ছিটকে বেরোনো আলোকস্তম্ভ জড়িয়ে আছে ভোরের কুয়াশা। দোকানি ঝাঁট দিচ্ছে চারদিনের জমে থাকা ধুলো-ময়লা। ট্রেনটা এই মাত্র চলে গেল। ফেলে গেল লাল সিগন্যাল, ঘাস, ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির এবং সেই ইস্টিশন। যা চারদিন আগে ইথার মাধ্যমে তরঙ্গ তুলে সাত-আট ঘন্টা জমিয়ে দিয়েছিল আমাদের বোকা বাক্সের সামনে। একজন-দু'জন করে চার-পাঁচজন জড়ো হল দোকানে। ছিটকে বেরোতে থাকল প্রিন্ট-মাধ্যমের ওপর জমে থাকা আক্রোশ। দুধ যে দিয়ে যায়, সে কোথা থেকে কী খবর পেয়ে পাড়ি দিয়েছে অন্য গ্রামে। সত্তর আশিজন পুলিশ নাকি তল্লাশি চালাতে আসবে আজ। কোথাও তাদের কোনও চিহ্ন নেই। এক গ্রামবাসী বুদ্ধি করে একটু দুধ এনেছিল। বিয়োদ্গারের সাথে সাথে ওই দুধটুকুও সে এগিয়ে দেয়। চায়ের ধোঁয়া স্টোভ থেকে গ্লাস হয়ে টেবিলে আসে... সেই চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুধুই বাসি ঘটনার আঁচ নেওয়া দুই ট্রেনযাত্রী।

একা জেগে আছে শুক্ল অষ্টমীর চাঁদ। দেখছে, ক'দিন ধরে গ্রামে রাতে কেউ ঘরে থাকে না। বাঁশঝাড়ের আঁধারঘুঁজিতে, গাঁয়ের পিছনে দিগন্তের দিকে চলে যাওয়া ধানখেতের শীতল আশ্রয়ে ঘুমায় তারা। নিতান্তই সব উলুখাগড়ার দল। সেইদিন থেকে একটা ভয় জাপটে ধরেছে গোটা গ্রামকে। কেউ হাতের কাছে রেখেছে অ্যাসিড, কেউ উনানে বসিয়ে রেখেছে জল। কেউ ছেলে মেয়ে বৌকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছে আত্মীয় বাড়ি। সময়ের রাশ টেনে ধরা কুর্চি-শাল-মহুলে ঢাকা গ্রামগুলোর লাল মাটির রাস্তা থেকে ধুলো উড়তে শুরু করেছে। নাঃ তারা কেউ এখনো আসেনি। বাম-ডান-বাম-ডান সেই ছন্দোবদ্ধ ভয়ের শব্দ শোনা যায়নি... এখনও। শুধুই ত্রস্ত পায়ে বনজ শব্দে ভয়ের উঁকিঝুঁকি।

তবুও চলেছে সব স্বাভাবিক কাজ। একে একে খুলে গেছে দোকান। মাঠের জমে থাকা জলে ঘুনি পাততে চলেছে চাষি। আর তারই সাথে জড়িয়ে থাকে অনিশ্চয়তা। কালকের জন্য বেঁচে থাকার ভয় ... জোয়ান ছেলেটা নাতিকে নিয়ে গেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। অশীতিপর দাদু ভাবে নাতিটা কেমন আছে! ঠাকুমার প্রশ্ন, সে কী খেয়েছে কাল? বুড়ো-বুড়িতে গতকাল ঝগড়া হয়েছিল, দাদু চেয়েছিল ঘর ছেড়ে বাঁশ-বাগানে রাত কাটাতে। তাতে শঙ্কিত 'হার্মাদ'দের হাত থেকে হয়তো বাঁচা যাবে। ঠাকুমা মরার জন্য ঘরকেই শ্রেয় মনে করেন। ঘুম-পাড়ানি বর্গিরা আসেনি গতকাল। আজ কী হবে? কাল, পরশু ... ?? চাষের ধান উঠতে এখনও কিছু দেরি। ঘরে চাল নেই। কে আনতে যাবে? অবশিষ্ট দাঁতকটা দিয়ে চালভাজাটুকু নরম করে, আজকের মতো ওই দিয়েই প্রাতঃরাশ সারা হল। কালকের কথা ভাবা যাবে কাল ...

বাড়ছে যৌথ বাহিনীর অত্যাচার
শুরু হয়েছে কমিটির 'সশস্ত্র প্রতিরোধ'

হারাধন জাল, ঝাড়গ্রাম, ৩১ অক্টোবর •

টানা একপক্ষ কাল ধরে মাওবাদী এবং পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি বাঘবন্দীর খেলায় সরকার-প্রশাসনকে তুর্কি নাচন নাচিয়েছে। সাঁকরাইল থানার ওসি অতীন্দ্রনাথ দত্ত অপহরণ নাটক শেষ হতে না হতেই আবার দেশের হাই প্রোফাইল যাত্রীবাহী ট্রেন রাজধানী এক্সপ্রেসকে তারা অবরোধ করল।

কমিটির জননেতা ছত্রধর মাহাতোর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে এবং যৌথ বাহিনীর অত্যাচারের প্রতিবাদে ২৭ এবং ২৮ অক্টোবর জুড়ে জঙ্গলমহলের তিন জেলায় কমিটির সর্বাত্মক বনধ হয়েছে। এলাকায় এলাকায় প্রায় প্রতিদিন তারা তাদের কর্মসূচী পালন করছে।

অন্যদিকে যৌথবাহিনী জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ এলাকায় যেমন গোয়ালতোড়, ধরমপুর, লালগড়, ভীমপুর, ধেরুয়া প্রভৃতি এলাকায় নারী পুরুষ সহ সবার ওপর অত্যাচার শুরু করেছে। বাহিনীর অত্যাচার এতটাই বেড়েছে যে এলাকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও ভয়ে আতঙ্কে গ্রামছাড়া। কমিটির অভিযোগ, এলাকার মেয়েরাও চূড়ান্ত হেনস্থার শিকার। গায়ে হাত তোলা, শ্লীলতাহানি, কোনওটাই বাদ যাচ্ছে না।

এর বিরুদ্ধে কমিটির নেতারা রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে — 'মা-বোনেদের অনেক রক্ত ঝরেছে, কিন্তু আর নয়। সবাই আমরা অস্ত্র হাতে যৌথ বাহিনীকে রুখব'। লালগড় আন্দোলনের একবছর পর কমিটি তাদের চূড়ান্ত পদক্ষেপ 'গণ মিলিশিয়া' হাজির করে যৌথ বাহিনী ও সরকারকে সঙ্কটে ফেলেছে। এমতাবস্থায় জঙ্গলমহলের খেটে খাওয়া এবং নিরীহ মানুষ আতঙ্কে প্রহর গুনছে।

সম্পাদকের কথা

সুন্দরবনের ধানচাষ নিয়ে অনুসন্ধান জরুরি

আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারলাম, এবার সাতজেলিয়া দ্বীপের দয়াপুর গ্রামে ধানের দারুণ গোছ হয়েছে। এমন ফলন সেখানে আগের বছরগুলোতেও হয়নি। আইলার ঝড়ে ওখানেও নোনাজল ঢুকেছিল। কিন্তু নোনা হয়তো মাটিতে সেভাবে বসে যায়নি। দয়াপুরের খবরটা শুনে ভালো লাগল। কারণ আমরা নিজের চোখে দেখে এসেছি, ওই দ্বীপেরই লাহিড়ীপুরে এবং অন্য বহু দ্বীপে, কীভাবে নোনাজল জমির ঘাস পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে; কীভাবে মরীয়া চাষিরা অন্য জমিতে বীজতলা করে এনে গাছ লাগিয়েও ধানের ফলন পায়নি; মাঠের পর মাঠ চাষের অযোগ্য হয়ে গেছে। অথচ দয়াপুরে নোনাজল ঢোকা সত্ত্বেও অপূর্ব ধানের ফলন হয়েছে। অতএব সুন্দরবনে ধানচাষ নিয়ে চাষিদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুসন্ধান করা দরকার। শুধু নোনাজমির বীজ নিয়েই নয়, নদীবাঁধ, ফিশারি ও চাষের জমির অবস্থান, এরকম আরও অনেকদিক থেকেই এই অনুসন্ধান আজ জরুরি।

অন্য পত্রিকার পাতা থেকে

ঝাড়খণ্ডের ভাষা

যুক্তিবাদী কন্ঠস্বর, জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৯, দাম ৫ টাকা, সম্পাদক সোমনাথ দত্ত (৯২৩৪৭৫১৩২০) •

... ঝাড়খণ্ডের ভাষিক চরিত্র : এই রাজ্যে বহু ভাষাভাষী মানুষের বসবাস। তাই কোন একটি ভাষাকে ঝাড়খণ্ডী ভাষা বলা উচিত হবে না। বললে তা হবে ভাষা সাম্রাজ্যবাদীদের অনুরূপ বিকৃত মানসিকতা। অনেকে বলেন, মহারাষ্ট্রে মারাঠি, পশ্চিমবাংলায় বাংলা, আসামে অসমীয়া, উড়িষ্যায় উড়িয়া ভাষা যদি থাকতে পারে, ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ডী ভাষা কেন হবে না? প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্নই এসে যাচ্ছে। প্রশ্নটি হল আমরা কোন ভাষাকে ঝাড়খণ্ডী বলব? হো, মুণ্ডারী, নাগপুরিয়া, কুড়ুম, পঞ্চপরগণিয়া ইত্যাদির মধ্যে কোন ভাষাটিকে বলব বিস্তৃত ঝাড়খণ্ডে ঝাড়খণ্ডী ভাষা? এখানে এক একটি অঞ্চলে এক একটি ভাষার প্রাধান্য। কিন্তু কোনভাবেই বৃহত্তর অর্থে কোন একটি ভাষা ঝাড়খণ্ডের একমাত্র ঝাড়খণ্ডী ভাষা হওয়ার দাবি করতে পারে না। অনেকে দাবি করেন রাঢ়ী ভাষাই একমাত্র ঝাড়খণ্ডী ভাষা এবং ঝাড়খণ্ডে এই ভাষাটিকে সর্বসাধারণের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এ ব্যাপারে ভাষাবিদগণ কী বলেন দেখি? ... (লেখক বাসুকী নাথ দাস)

রাস্তার ধারে বাস করার ঝক্কি

সংবাদ পরিষেবা, জুলাই ২০০৯, ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, সম্পাদক সুব্রত কুণ্ডু (০৩৩-২৪৪২৭৩১১) •

যানবাহন চলাচল করে এমন রাস্তার পাশেবসবাস করা ক্ষতিকারক। কারণ শব্দ ও বায়ুদূষণ থেকে নানান জটিল অসুখ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে জানা যায় যানবাহনের দূষণ থেকে গেঁটে বাত বা অস্থিসন্ধি ও শরীরে অন্যান্য স্থানে যন্ত্রণাদায়ক প্রদাহ হয়। সাধারণত বয়স, ধূমপান এবং প্রজনন সংক্রান্ত জটিলতা এই অসুখের কারণ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে রাস্তার ধারে বাস করলেও এই অসুখ হতে পারে। যারা রাস্তার ৫০ মিটারের মধ্যে বাস করে তাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ, যারা ২০০ মিটার দূরে বাস করে তাদের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

চলে গেলেন 'বাংলার চালচিত্র'র রূপকার আব্দুল জব্বার

'বাংলার চালচিত্র' পড়ে অন্নদাশংকর রায় বলেছিলেন 'গ্রাম বাংলার কথ্য ভাষার জীবন্ত অভিধান'। সেই মাটির গন্ধ মাখা, মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের জীবন নিয়ে সাহিত্যের রূপকার আব্দুল জব্বার ২৯ অক্টোবর ২০০৯ বৃহস্পতিবার ভোরে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আচমকাই চির বিদায় নিলেন। রেখে গেলেন স্ত্রী, তিন পুত্র, তিন কন্যা সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠকদের।

সামসুদ্দিন পুরকাইত, হাজিরতন, মেটেবুরুজ, ২৯ অক্টোবর •

২৯শে অক্টোবর ২০০৯ ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে মোবাইলটা ঝনঝনিয়ে বেজে উঠেছিল। তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। ভেবেছিলাম আরবের মক্কা শহর থেকে বুঝি ফোনটা এসেছে। আগের দিন কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হজ্ব করতে গিয়েছেন, তাঁদেরই কেউ ফোনটা করে থাকবেন। প্রথমে এমনটাই ভেবে নিয়েছিলাম, কিন্তু হ্যালো বলতেই অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এল 'আপনি সামসুদ্দিন ভাই বলছেন কি?' হ্যাঁ-বলতেই পরের কথাটা মাথায় ঢুকতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। 'আব্দুল জব্বার মারা গিয়েছেন। আমি ওঁর ছেলে বলছি।'

– জব্বার মানে? সাহিত্যিক আব্দুল জব্বার?

– হ্যাঁ, উনি একঘন্টা আগে ভোর চারটায় এন্তেকাল করেছেন। আপনি আপনাদের ওখানকার পরিচিত সকলকে একটু জানিয়ে দেবেন।

চোখে আর ঘুম এল না। বছর ছয়েক আগের কথা। কে যেন বলছিল জব্বার সাহেবের খুবই আর্থিক অনটন চলছে, শরীরটাও ভালো নেই। কথাটা শুনেই দুদিন পর আমার দ্বি-চক্র যানটা নিয়ে কাউকে না জানিয়ে খুঁজতে খুঁজতে হাজির হয়েছিলাম জব্বার সাহেবের বাড়িতে। ঠিকানা বলতে জানতাম বজবজ-বিড়লাপুর ছাড়িয়ে বাওয়ালি বলে একটা জায়গার। তাও বহুবছর আগে যখন ক্লাস নাইনে পড়তাম তখন শোনা। আমার পিতৃদেবের এক বন্ধু হাসান থান্দারের সঙ্গে জব্বার সাহেবের ঘনিষ্টতা ছিল। সেই সূত্রে পিতার সঙ্গে পরিচয় এবং জব্বার সাহেবের কোন এক উপন্যাসের পটভূমি গঙ্গার তীরবর্তী বদরতলা অঞ্চল হওয়ায় আমাদের বাড়িতে অতিথি রূপে তাঁর আগমন। তাঁকে নিয়ে সেই ১৯৭৩ সালের একদিন দিনভোর বদরতলা ঘুরিয়ে দেখানো, তারপর তাঁর লেখা নিয়ে মধ্যরাত পর্যন্ত ময়নাতদন্ত। সে সব কথা স্মৃতিতে আজও অমলিন। ইলিশ মারির চর, বাংলার চালচিত্র লিখে তখন তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজের আসন সু-প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। তাঁর সেই সাহিত্য রচনার মধ্যগগনে থাকার সময় জব্বার সাহেবের সান্নিধ্যে আসা এবং মাত্র ক্লাস নাইনে পড়া একটা পুঁচকে ছেলের তাঁর লেখা নিয়ে কথা বলার বেয়াদপিটা তাঁরও যে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর মনে ছিল, তা পরে জেনে আমিও চমৎকৃত হয়েছিলাম।

২০০৩ সালের এরকমই শীত আসি আসি সময়ের এক দুপুরবেলায় তাঁর বাড়িতে সটান গিয়ে হাজির। তখন তিনি বেশ অসুস্থ এবং মানসিক ভাবে কিছুটা অস্থির। কথাবার্তায় অসংলগ্নতা বেশ বোঝা যায়। শুনলাম তিনি পি.জি.তে ভর্তি ছিলেন কিন্তু দুদিন আগে কাউকে না জানিয়ে হাসপাতাল থেকে চলে এসেছেন। সেটা নিয়েও একটা ঝামেলা। পরে অবশ্য মিটে যায়। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে নজরুল ভাইয়ের (টিনা ড্রেসেস) উদ্যোগে বড়তলা ওয়ান-অ্যান্ড-অল ক্লাবের পক্ষ থেকে দিন কয়েক পর হাজার পাঁচেক টাকা তাঁর স্ত্রীর হাতে চিকিৎসার জন্য তুলে দিয়ে আসি। তখনই জানতে পারি, ওঁর বাসস্থানের শোচনীয় অবস্থা দেখে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিআইটি রোডের সরকারি আবাসনে একটি ফ্ল্যাট দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি সেখানে যেতে রাজি হননি। বলেছিলেন, 'এখানকার শিকড় থেকে উপড়ে নিলে আমার লেখাই হারিয়ে যাবে। মাটির সঙ্গে যোগ না থাকলে আমি লিখব কেমন করে?' তারপর কেটে গেছে বেশ কিছুদিন। আমরা নিজেদের সাধ্যমত ব্যক্তিগত ভাবে, কখনও আমাদের সংস্থা 'মাটির কেল্লা'র তরফ থেকে জব্বার সাহেবের চোখের চিকিৎসায়, আরও নানা বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করেছি।

তাঁর শেষ যাত্রায় মাটির কেল্লার পক্ষ থেকে 'মন্থন সাময়িকী'-র সম্পাদক জিতেন নন্দী ও আমি পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছি। তাঁর আত্মার চির-শান্তি কামনা করি।

সন্তোষপুর প্ল্যাটফর্মে শহীদুলের দোকানদারি

জিতেন নন্দী, সন্তোষপুর, ১২ অক্টোবর •

সকালবেলায় হেলে-দুলে দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকে শহীদুল। এবার দোকানটা সাজিয়ে ফেলতে হবে। গায়ের সাদা গেঞ্জিটা গুটিয়ে বুক পর্যন্ত তুলে দেয় শহীদুল। লুঙ্গির ওপর ন্যাঙ্গা বেরিয়ে পড়ে ওর প্রমাণ সাইজের ভুঁড়িটা। ওটা দেখলে টের পাওয়া যায়, ছেলেটা যেন একটু আয়েশি। মুখে পান নিয়ে চিবোতে থাকলে তো আরও চেনা যায় এ ছেলের আরামপ্রিয় ভঙ্গীটাকে।

শহীদুলের দোকান সাজানোটা আমার কাছে বেশ কৌতূহলের। কেননা ওর পেটি থেকে কী কী বেরোবে বলা মুশকিল। প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমান অর্বাচীন যাত্রীরা টেরিয়ে টেরিয়ে ওর মালগুলো দেখতে থাকে। নিত্যযাত্রীদের কেউ কেউ খাতিরে হাতও লাগায় ওর সঙ্গে। আগে ও বসত লোহার রেলিং ঘেঁষে, প্ল্যাটফর্মের ওপর প্লাস্টিক বিছিয়ে। বছর খানেক হল একটা চৌকি হয়েছে ওর। রাতে শেকল দিয়ে প্ল্যাটফর্মেই বাঁধা পড়ে থাকে সেটা।

গরমকালটা ওর দোকানে ছিল গুটিকতক প্লাস্টিকের গামলা ভরা নানান কিসিমের কাপড় ধোলাইয়ের সাবান, মানে ডিটারজেন্ট। কোনটা সাদা, কোনটা নীল, কোনটা আবার কাদা রঙের — দেখলে মনে হয় যেন একতাল মাটি এনে রাখা হয়েছে গামলা ভরে। তার পিছনেই একটা ছোটো দাঁড়িপাল্লা। কাস্টমার চাইলে শহীদুল হাতা দিয়ে ওই কাদার মতো সাবান কেটে প্লাস্টিকে ভরে ওজন করে দেয়। দাম বেশ সস্তা। পাশেই থাকত নানান রঙের বাহারি মোড়কে পোরা গায়ে মাখার সাবান, দেখলে সৌন্দর্য সাবান লাক্সের মতো লাগে। এছাড়া থাকত কিছু টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, সিনথেটিক/প্লাস্টিকের ছোবড়া, আরও টুকিটাকি।

এবার কালবৈশাখীর বদলে এসেছিল আইলা ঘূর্ণিঝড়। শহীদুলের কারবার পাল্টে যেতে থাকল। সাবান সরিয়ে সরিয়ে এল নানান রঙের লেডিজ ছাতা আর কালো জেন্টস ছাতা। দাম চল্লিশ/পঞ্চাশ। ক্রমশ সাবান বিদেয় হল। বর্ষাকালে পুরো চৌকি জুড়ে আর ওপরের তারে ঝুলতে থাকল ছাতাগুলো। কিন্তু বর্ষা সময়মতো এল না। আকাশের মেঘ যেন শহীদুলের কালো মুখটা জুড়ে ভিড় করল। ওর হাসিখুশি ফাজিল ভঙ্গীটা উবে গেল। আমি বললাম, 'কী, বিক্রি হচ্ছে না?' শহীদুল আকাশের দিকে দেখিয়ে বলে, 'কী বলব বলুন? জল কোথায়?'

বর্ষা এল না বটে। কিন্তু রমজান মাস এসে গেল। শহীদুল পড়ল কিঞ্চিৎ ফাঁপরে। একগাদা ছাতা তুলে এনেছিল মার্কেট থেকে। সেগুলো পড়ে রইল ঘরে। করজ করে ওস্তাগরের দলিজ থেকে ক'ডজন বেবিস্যুট আর জিন্সের প্যান্ট তুলতেই হল। ছাতাগুলো এক সাইডে সরিয়ে দিয়ে চৌকি দখল করল সেগুলো। কিন্তু এবার ঈদের বিক্রিবাটা কম। তার ওপর সন্তোষপুর স্টেশনের দুটো প্ল্যাটফর্মে গজিয়ে উঠল নতুন আরও গোটা পনেরো জামাকাপড়ের স্টল। শহীদুলকে বেশ মনমরা দেখায়। ও সাধারণত কাস্টমারের সঙ্গে বেশ হালকা মুডেই কথাবার্তা বলে। কিন্তু সেদিন দেখলাম, একটা ছেলে জিন্সের প্যান্টগুলো ভাঁজ খুলে খুলে দেখল, তারপর নিল না। শহীদুল চটেমটে দু'চার কথা শুনিয়ে দিল। বুঝলাম, অবস্থাটা ভালো নয়।

ঈদ এগিয়ে এল। একই সঙ্গে এল পুজো। বাজার তাগড়া হওয়ার কথা। অথচ হল না। লোকে পেটে ভাত দেবে, না কাপড়জামা কিনবে? হকারদের বাজারে মন্দা চলতে থাকল। সন্ধ্যের দিকে মায়েরা বাচ্চাগুলোকেও জুয়ার কাগজের বোর্ড বা সামান্য কিছু মাল দিয়ে প্ল্যাটফর্মে বসিয়ে দিল। যা কিছু দু'চার পয়সা আসে। এরই মধ্যে আচমকা দু'দিন ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এল। আমি ছাতা মাথায় দিয়ে স্টেশনে ট্রেন ধরতে গেছি। শহীদুল আমাকে দেখেই গদগদ ভঙ্গীতে বলল, 'দাদা, পুরো স্টক খালাস করে দিয়েছি।' বুঝলাম, ছাতাগুলো ওর ওপর বোঝা হয়ে গিয়েছিল, বৃষ্টি আসায় সেগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। যাক্, এবার ও ঈদের কারবারে মন দিতে পারবে।

তারপর ঈদ কেটে গেল, পুজোও কাটল। দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মের মুখটায় গিয়ে দেখি, শহীদুলের চৌকিটা ফাঁকা। বুঝলাম ও ঈদের ছুটি কাটাচ্ছে। ওর বুকের ওপর গেঞ্জি তোলা সুখী ভঙ্গীটা আমার মনের আর্শিতে ভেসে উঠল। শহীদুল তো অল্পেতেই বেশ খুশি থাকে। এরপর আসছে শীতকাল। এবার নিশ্চয় ও গেল বছরের মতোই লাটে গরমের জামাকাপড় তুলবে।

চাষজমি দখল, সংকটে কৃষি

গিয়াসুদ্দিন পাইক, আকড়া মহেশতলা, ২ অক্টোবর

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কৃষিজমি আগামীদিনে চাষির হাতে থাকবে কি? বছরে দু'তিনটে ফসল হয়, এমন জমি একশ্রেণীর দালাল, ছোটো বড়ো কারখানার মালিক, প্রোমোটার, লুটেরারা যেভাবে আত্মসাৎ করতে শুরু করেছে, ভয় হয়, সমস্ত চাষের জমিটাই আগামীদিনে দখল হয়ে যাবে। চাষবাস তো দূরের কথা, খোলামেলা হাওয়া, গবাদি পশুর সবুজ ঘাসের ওপর সাবলীলভাবে বিচরণ করা, পাখি-কীটপতঙ্গের ডানা মেলে ওড়ার অবকাশটুকুও আগামীদিনে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এর ফলে জমির দাম বেড়েছে, নিম্নমধ্যবিত্তদের মধ্যে জমি কেনাবেচার প্রক্রিয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে, ইচ্ছা থাকলেও চাষি চাষের জন্য জমি কিনতে পারছে না। এইভাবে হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, নদিয়া, দুই চব্বিশ পরগণার সমস্ত হাইওয়ের দু'পাশের জমি বহুদিন আগেই হাতবদল হয়ে বিনা চাষে অনুর্বর হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ, সাতগাছিয়া, বিড়লাপুর, রায়পুর, ৭৫ ও ৭৬ নং বাসরুটের দু'পাশের জমির হাতবদল তো চোখে দেখা।

এই তো সেদিনকার কথা। বজবজ এলাকার সব লোক কমবেশি যাঁকে চেনে, সেই জগন্নাথ গুপ্তার কথা বলি। অতীতে বাঁকে করে তেলমিল থেকে তেল নিয়ে বিক্রি করতেন। আজ জমির দালালি করে তিনি কয়েকশ বিঘা জমির মালিক। ওঁর মাধ্যমে নামে-বেনামে কয়েকশ একর জমি চাষির হাত থেকে প্রোমোটারদের দখলে চলে গেছে। বজবজ রোডের ওপর বেশ কয়েকশ একর চাষের জমির ওপর গড়ে উঠেছে ইডেন সিটি। তার জমির দালালির সঙ্গেও জগন্নাথ গুপ্তা যুক্ত ছিলেন। এখন সেখানে চাষবাস নষ্ট করে ধনীদের জন্য আরাম আয়েশের ফ্ল্যাটবাড়ি বানানো হচ্ছে। পাশে একটা গ্যাস কোম্পানি, যার মজুর সংখ্যা চারশ'র ওপর। ওই কোম্পানিকেও মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এছাড়া তারাতলা, জিনজিরা বাজার থেকে বাটামোড় পর্যন্ত একটা ফ্লাইওভার করার পরিকল্পনা হচ্ছে। সেটা হলে শত শত ছোটো-বড়ো দোকানদার ও ব্যবসায়ী উচ্ছেদ হবে।

এই বাটামোড়ের লাগোয়া বাটা কোম্পানি শুধু ফ্যাকট্রির জায়গাটুকু বাদ রেখে বাকি সমস্ত ফাঁকা জমিতে টাউনশিপ গড়ছে। শুনেছি, এই বিরাট জমিটা স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে ১৯৪০ সালে অধিগ্রহণ করে বাটা কোম্পানিকে শিল্পের স্বার্থে দেওয়া হয়েছিল। আজ বাটা কারখানাকে শুকিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। তাহলে মাঝখানের সত্তর বছরে যে জীবন ও কাজকর্ম গড়ে উঠেছিল এখানে বাটা কারখানাকে কেন্দ্র করে, তা খতম করে ফেলা হল। মাঝখান থেকে চাষের জমিগুলো ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেল। সরকার ও দখলদারদের এই বেওকুফির জন্য মরছি আমরা সাধারণ মানুষ।

জলাজমি ভরাট, সংকটে খাল-বিল

অচ্যুত সেনগুপ্ত, বালি, ২৯ অক্টোবর

প্রদীপের নিচে থাকা অন্ধকারের মতোই অপরিকল্পিত প্রগতি তার বহমান অপদার্থতার কারণে নিত্য নাড়া দেয় আমাদের মনকে। পরিবার পরিজনের একরাশ ঘৃণা মিশ্রিত হাহাকার প্রশমন করার দায়িত্ব কার? শুধু মাত্র নিকাশি নালার উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে বাড়ির উঠোনে জমে থাকা জলে ২০০৭ সালে হাওড়া জেলার পশ্চিম শান্তিনগর অঞ্চলে দেড় বছরের শিশু বিজয় তেওয়ারি ও সাড়ে তিন বছরের সুকন্যা সরকারের জলে ডুবে মৃত্যু ঘটে। এর কারণ অনুসন্ধান ও ভবিষ্যতে এরকম হৃদয়বিদারক ঘটনা না ঘটার প্রতিশ্রুতি উপস্থিত দপ্তর বন্টনকারী ব্যবস্থাপকদের অপদার্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়। যার পরবর্তী সংযোজন এবছরের (২০০৯) দুর্গাপুজোর সপ্তমীতে চল্লিশোর্ধ মৃগিরোগ আক্রান্ত ব্যক্তি তারক ঘোষের জলে ডুবে মৃত্যু। এর শেষ কোথায়?

এলাকার সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনায় জানা গেছে যে সেখানকার জলনিকাশি ব্যবস্থা, আদ্যিকালের কিছু খাল, যেমন সূতি খাল, করার খাল, সাহেব খাল ও শ্যাওড়াপোতার ওপরে নির্ভরশীল। বনগাটির মোড় থেকে কালিপুর হয়ে অন্যপাশে রয়েছে বালি খাল। জগদীশপুর, জয়পুর, সাপুইপাড়া, আনন্দনগর, বাসুকটি — বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় একলক্ষ মানুষের বেঁচে থাকা ও বাঁচতে চাওয়ার অন্যতম দাবি, ওই জলাধারগুলোর উপযুক্ত সংরক্ষণ।

সেই দাবিকে পাশ কাটিয়ে বোধবুদ্ধিহীন আনমোল পার্ক হতে চলেছে আনমোল সাউথ সিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টের দাক্ষিণ্যে। মুম্বই রোডে জয়পুর বিল স্টপেজের উল্টোদিকে চারপাশ আড়াল করে প্রতিদিন একের পর এক ফ্লাইঅ্যাশ ফেলা হয়েছে দু'হাজার বিঘে জলাভূমি ভরাটের উদ্দেশ্যে। যার ভেতর দক্ষিণ হতে উত্তরে বয়ে গেছে সংযোগকারী সাহেব খাল। দ্রুততার সাথে চল্লিশ ফুট চওড়া খালের সংকোচন ঘটানো হয়েছে ভাড়ার কাজে লাগানো গাড়িগুলোর যাতায়াতের পথ তৈরি করতে। শুধুমাত্র কয়েকটা চুং পাইপকে জলের প্রবাহ বন্ধ না হওয়ার প্রগতিশীলতার মোড়কে বাইগাছি, জগদীশপুর, চামরাইল ও জয়পুর বিল — এই চারটি মৌজার পরিবেশ সংক্রান্ত ভারসাম্যের ওপর আঘাত হানতে চলেছে এই ধরনের অপরিকল্পিত ব্যবসায়িক অভিসন্ধি। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগানো হচ্ছে সিন্ডিকেট নামক সংগঠিত গোষ্ঠীকে। জলাভূমি ভরাটের বিষময় ফল সম্পর্কে সরকারি দপ্তরও নীরব কেন?

জলাভূমি বাঁচাও কমিটি

এই ধরনের অনৈতিক ও অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমত তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে বালি জগাছা ব্লক জলাভূমি বাঁচাও কমিটি। মুখ্য উদ্দেশ্য, অপ্রশস্ত নিকাশি নালার উপযুক্ত সংরক্ষণের মাধ্যমে সেগুলোর নাব্যতা বাড়ানো, যাতে জমা জলে ডুবে মৃত্যুর মতো হৃদয়বিদারক ঘটনা ভবিষ্যতে আর না ঘটে। জলাভূমি ভরাটের বিরোধিতা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচার অভিযান, লিফলেট বিলি, পথসভা, গণ-অবস্থানও চলছে। ফলশ্রুতিতে ওই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জমি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভীত সন্ত্রস্ত চল্লিশজন কৃষিজীবীকে সংযোজিত করেছে এই আন্দোলনে। তথ্য জানার অধিকার আইনে সরকারি দপ্তরে চিঠি চালাচালি হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের জনস্বার্থ মামলায় যেতে বাধ্য হয়েছে, যখন জানতে পারা গেছে যে ওই ব্যবসায়িক উদ্যোগের সঙ্গে সরকারি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশনও জড়িত।

শিল্পায়নের সোনালী স্লোগান কি হতভাগ্য শিশুদের মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে পারবে? আদৌ পারে কি মৃগিরোগ আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারে সান্ত্বনা দিতে?

গার্লস মাদ্রাসায় পুরুষ শিক্ষক

চারের পাতার পর

কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পরে সম্পাদক সাইফুদ্দিন মোল্লা মত পরিবর্তন করেন। এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'আমরা ওইদিন (২৬ অক্টোবর) বেলা তিনটে নাগাদ ম্যানেজিং কমিটির মিটিং ডাকি। সেখানে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। ওই আলোচনায় কোন সমাধান সূত্র বার হয়নি। ওই সভায় বর্তমান সভাপতি হাজি গোলাম মহিউদ্দিন অনুপস্থিত ছিলেন।'

আকড়া গার্লস মাদ্রাসায় গিয়ে প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে দেখা করে জানতে পারি, তিনি সমস্ত বিষয়টা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে জানাবেন। সেখান থেকে যা সিদ্ধান্ত হবে তা মেনে নেবেন। কিন্তু এলাকার একটি রাজনৈতিক দলের দু'একজন কর্মীর খারাপ ব্যবহারে তিনি আহত হয়েছেন।

ওইদিন অর্থাৎ ২৬ তারিখের বিক্ষোভকারীরা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকাকে একটি ডেপুটেশন দেন। বাইরে কিছু পোস্টারও দেখা গেছে। সেখানে লেখা আছে — এখানকার মেয়েদের এম.এস.সি পাশ করার সুযোগ দিতে হবে; পুরুষ শিক্ষক নিয়োগের চক্রান্ত ব্যর্থ করুন; স্বার্থান্বেষী মহলের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও; মুসলিম মেয়েদের আব্রু রক্ষার্থে গার্লস মাদ্রাসায় পুরুষ শিক্ষক নেওয়া চলবে না; অবিলম্বে গার্লস মাদ্রাসায় মেয়ে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে; ইত্যাদি। পোস্টারের নিচের দিকে লেখা ছিল, মাদ্রাসা শিক্ষা বাঁচাও কমিটি।

লড়াই করে পরিচয়পত্র আদায় করল তিনটি কয়লাখনির ঠিকা শ্রমিকেরা

• তারা যে খনি-শ্রমিক তার স্বীকৃতি

• আগের তুলনায় মাইনেও বেড়েছে

সুদীপ্তা পাল, আসানসোল, ১৮ অক্টোবর •

প্রায় আড়াই বছর ধরে আন্দোলন চলার পর ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)–এর সোদপুর এরিয়ার তিনটি কোলিয়ারিতে মোট ৩৫ জন ঠিকা শ্রমিককে পরিচয়পত্র হাতে দেওয়া হল। এই পরিচয়পত্র শ্রমিকেরা পেয়েছে ঠিকেদারের কাছ থেকে। আমাদের দেশে রেলশিল্পের পরেই সবচেয়ে বেশি শ্রমিক কাজ করে কয়লাশিল্পে। ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো কয়লাখনি অঞ্চলে স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বেআইনি কার্যকলাপ পুরোদমেই চলছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা ও নেত্রীদের চোখের সামনে সরকারের মাইনে পাওয়া শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এইসব বেআইনি কাজ চলছে প্রায় ৩৫ বছর ধরে। এই ৩৫ বছর ধরে ইসিএলে রয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিও। এর মধ্যে ৬টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সারা ভারতের কয়লা শ্রমিকদের জন্য যৌথ দ্বিপাক্ষিক কমিটি (জয়েন্ট বাইপার্টাইট কমিটি ফর কোল ইন্ডাস্ট্রি)–র সদস্য। ব্যক্তি হিসেবে এঁরা দেশের তাবড় তাবড় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। এছাড়া, ইসিএলের যৌথ পরামর্শদাতা কমিটিতেও রয়েছেন জয়ন্ত পোদ্দার বা আর সি সিংয়ের মতো পুরনো অভিজ্ঞ নেতারা। আশ্চর্য হতে হয়, এঁরা ইসিএল সহ কোল ইন্ডিয়ার বিভিন্ন সাবসিডিয়ারিতে জাতীয়করণের সমসাময়িক কাল থেকে এই বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে একবারও সরব হননি। সামান্য যদি বা কখনও মুখ খুলে থাকেন, তার কোন ফলাফল আমরা আজ পর্যন্ত ইসিএলে কাজ করা ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখতে পাইনি।

শ্রমিক হিসেবে কোন পরিচয়পত্র ইসিএলের ঠিকা শ্রমিকদের নেই। তারা যে ইসিএলের কয়লাখনির অন্ধকারে কাজ করতে যায়, নেই তার কোন প্রমাণ। স্থায়ী শ্রমিকদের থেকে আলাদা রেজিস্টারে হাজিরা করে শ্রমিকেরা খাদে যায়। হাজিরা খাতায় শুধু একজন শ্রমিকের নাম লেখা থাকে আর যে বাতি নিয়ে তারা খনিতে নামে, সেই বাতিনম্বর লেখা থাকে। কিন্তু এই শ্রমিকদের ছবি সহ নাম ঠিকানা 'বি' ফর্ম রেজিস্টারে নথিবদ্ধ করে ইসিএলের কোলিয়ারি ম্যানেজমেন্টের কাছে থাকার কথা। কিন্তু তা বেশিরভাগ কোলিয়ারিতেই নেই। তার ফলে খনির ভিতর অ্যাকসিডেন্টে কোন ঠিকা শ্রমিক মারা গেলে প্রমাণ করা যাবে না যে, সে ওই নির্দিষ্ট একজন শ্রমিক।

এই পরিচয়ের দাবিতে ইসিএলের সোদপুর এরিয়ার ঠিকা শ্রমিকেরা প্রায় আড়াই বছর ধরে সংগঠিতভাবে লড়াই করছে 'অধিকার' সংগঠনের ব্যানারে। লাগাতার আন্দোলনের ফলে ম্যানেজমেন্ট সোদপুর এরিয়ার পাটমোহানা, বেজডি ও মিঠানী কোলিয়ারিতে পরিচয়পত্র ও 'বি' ফর্ম চালু করতে বাধ্য হয়। যদিও ইসিএলের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক কোলিয়ারিতে কড়া নির্দেশ পাঠিয়েছে — পরিচয়পত্র, ন্যূনতম মজুরি, কাউন্টার পেমেন্ট, পিএফ, মেডিকাল (কর্মরত অবস্থায় চোট লাগলে চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ) এবং হাজিরা লাগু করার জন্য। এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে পরিচয়পত্র সমেত নির্দেশগুলি অন্যান্য কোলিয়ারিতে দ্রুত লাগু করার জন্য শ্রমিকেরা চাপ বাড়াচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ও ঠিকাদারদের ওপর। শ্রমিকেরা ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য বড়ো আন্দোলনে নামার লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে। ইসিএল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মেনে কোন ঠিকাদার শ্রমিকদের দাবিগুলো মেনে নিতে চাইলেও অন্য ঠিকাদাররা সেখানে বাধা দিচ্ছে। ম্যানেজমেন্ট এবং স্থানীয় নেতাদেরও মদত পাচ্ছে নির্দেশ–অমান্যকারীরা। দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে এরা শ্রমিকদের বাধ্য করেছে সমস্ত রকম শোষণ ও বঞ্চনা মেনে চলতে।

প্রায় ২০০ জন শ্রমিক ইসিএল হেড কোয়ার্টার এলাকায় শাকতোড়িয়াতে মাটির ওপর ঠিকা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ইসিএলের বিভিন্ন পাম্পহাউস, ফিল্টার প্ল্যান্ট, হেড কোয়ার্টার এবং অন্যান্য অফিসে কর্মরত এই শ্রমিকেরা সাফাই ও রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন কাজ করে। কিছু ঠিকা শ্রমিক বড়ো বড়ো অফিসারদের কাছে, যেমন সিএমডি বাংলো, ডিরেক্টর বাংলোতে মালির কাজ, রান্না বা গার্ডের কাজ করে থাকে। এরা হাতে পায় বর্তমানে ৮০ টাকা। আজ থেকে তিন বছর আগে এই মাটির ওপরের ঠিকা শ্রমিকদের একমাসের ধর্মঘটের ফলে স্থানীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে এদের মজুরি ৩৫ টাকা থেকে বেড়ে হয় ৭০ টাকা। ঠিকাদারদেরও প্রতি শ্রমিক পিছু পাওনা বাড়ে ৬০ টাকা থেকে ৯৪ টাকা। নেতাদের সঙ্গে ম্যানেজমেন্টের মৌখিক চুক্তি হল। কিন্তু শ্রমিকদের ৭০ টাকা নিয়ে রেজিস্টারে সই করতে হয় ৯৪ টাকায়। বর্তমানে সেটাই এসে দাঁড়িয়েছে ৮০ টাকায় এবং ঠিকাদার পাচ্ছে ১১৪ টাকা। এইভাবে ঠিকাদার ও ম্যানেজমেন্ট পার পেয়ে গেল শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির ভুয়ো রেজিস্টার বানিয়ে। নেতারা লোকাল শ্রমিকদের ভোট পেল আর লোকাল ঠিকাদারকেও সন্তুষ্ট রাখল।

আবার কেউ যদি বলে, হাতে পাচ্ছি ৮০ টাকা, ১১৪ টাকায় সই করব না, তাহলে তার পেমেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। তবে শ্রমিকেরা ঠিক করেছে, ৯ নভেম্বর ২০০৯ থেকে যে নতুন ওয়ার্ক অর্ডার বেরোবে, তখন তারা ভুয়ো পেমেন্ট রেজিস্টারে সই করবে না এবং কাউন্টারের বাইরে ঠিকাদারের বাড়িতে পেমেন্ট নিতে যাবে না।

সিকিউরিটি গার্ডদের আরও দুর্দশা

গাঙটিকুলি পাম্পহাউসে ৮ জন সিকিউরিটি গার্ড কাজ করে। দামোদর নদীর জলের পাশে একটি অস্থায়ী টেন্টে তাদের পাহারা দিতে হয় প্রায় জঙ্গলের মধ্যে। তাদের কোথাও হাজিরা করানো হয় না। উপরন্তু কোন কিছু চুরি গেলে তাদের মাসের ১৮০০ টাকা মাইনে থেকে চুরি যাওয়া জিনিসের দাম কেটে রাখা হয়।

এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য শ্রমিকেরা একটু একটু করে সংগঠিত হতে শুরু করেছে। তারা অস্ফুটভাবে বলতে শুরু করেছে, নেতাদের আর মাঝামাঝি চুক্তি করার সুযোগ দেব না। নিজেদেরটা নিজেরাই বুঝে নেব।

আইলা ঝড়ে এখনও অশান্ত অভিশপ্ত নাপিতখালি

প্রদীপ কুমার মৃধা, সোনাঘাটি, বাসন্তী •

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী ব্লক ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত, যেটি সুন্দরবনের প্রবেশপথ বা সিংহদুয়ার। এর মধ্যে পিছিয়ে পড়া রামচন্দ্রখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি প্রত্যন্ত গ্রাম নাপিতখালি। বাসন্তী ব্লকে আইলাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম এই নাপিতখালি। গ্রামটি বাসন্তী ব্লক অফিস থেকে প্রায় ৫ কিমি উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। হোগল নদীর একটি শাখা, যেটি হানা নদী নাম ধারণ করে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে, সেই হানা নদীর পশ্চিম তীরের গ্রাম নাপিতখালি। গ্রামটি নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় আইলা তার রণনৃত্য করার সুযোগটি পেয়েছে বেশি।

এখানে প্রায় ২০০টি পরিবার আছে। যার ৯০ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী। এদের মধ্যে ৮০ শতাংশ মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ১৫ শতাংশ আদিবাসী এবং প্রায় ৫ শতাংশ অন্যান্য। গ্রামের অধিকাংশ মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তার ওপর আইলার তাণ্ডবে পান্তা তো দূরের কথা, খাওয়ার জলও পাওয়া দুষ্কর। গ্রামটিতে ১টি মাত্র পানীয় জলের কল আছে। সেখানে এক কলসী জলের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকতে হয়, আইলার প্রভাবে অধিকাংশ মানুষের জন্মভিটে ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে সরকারের মাটি না ফেলা মাটির রাস্তায়। সেখানে সরকারের দেওয়া ১টি ত্রিপলের মধ্যে ১২–১৩ জন। বিবর্ণ, জীর্ন পোষাকহীন শরীরে বাচ্চাগুলো এক মুঠো ভাতের জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। আইলা তাদের ঘরবাড়ি নিয়েছে, মুখের খাবার কেড়েছে, কেড়েছে তাদের বিছানা–মশারিও।

নোনাজলে মশা যেমন বেড়েছে, বেড়েছে দুর্গন্ধও। যেখানে সেখানে পায়খানা, প্রস্রাব। কারণ তাদের নির্দিষ্ট জায়গা নেই। ২০০টি পরিবারের মধ্যে ২ শতাংশ পাকা পায়খানা। ৫ শতাংশ স্যানিটারি প্লেট এবং বাদবাকি খোলা ময়দানে। রাতে বেশি দূরে যাওয়া যায় না। চারিদিকে নোনাজল ও বিষাক্ত সাপের উপদ্রব।

অদূরের ইটাভাটি গ্রামের অবস্থাও একইরকম

গ্রামটির দেড় কিলোমিটার দূরে ইটাভাটি গ্রাম, সেখানে একটি ফ্রি প্রাইমারি বিদ্যালয় আছে, আর আড়াই কিমি দূরে পঞ্চম–দশম শ্রেণী পর্যন্ত একটি হাইস্কুল আছে। রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হওয়াতে গ্রামের অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা বর্ষাকালে পড়াশুনার পাটটি চুকিয়ে দেয়। তারপর বই–খাতা–কলম স্কুলের পোষাক যদি না থাকে তাহলে স্কুল শিক্ষকগণের বেতের ভালোবাসায় ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। তাই গ্রামের ৯০ শতাংশ মানুষ অক্ষর জ্ঞানহীন।

গ্রামটি নদীর তীরে হওয়ায় গ্রামবাসীদের জীবন জীবিকাও তেমন। কেউ বা ধরে মাছ–চিংড়ি, কাঁকড়া, আবার কেউ বা মাটি কাটে। কেউ বা দিল্লি–বম্বে বা কোলকাতার বাবুর বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। নিজেদের জমিজিরেত বলতে তেমন কিছুই নেই। জমিদারের ভাগচাষি হিসেবে ভাগে পাওয়া ১–২ বিঘা জমি, ধানচাষ বা সবজি চাষ তেমন হয় না, মাছ চাষ হয় বেশি। বার বার নদীবাঁধ ভেঙে ১–২ বিঘা জমি কারও কারও নদীগর্ভে গেছে। আইলাতে নোনা জল ঢোকায় এলাকা লবণাক্ত। আকাশে নুন, বাতাসে নুন, জলে নুন হওয়ায় মাটিতেও নুন। তাই এলাকাটা লবণ হ্রদে পরিণত হয়েছে। গ্রামে এমনিতে কাজ কম, আইলাতে কাজকর্ম একেবারে গেছে। তাই গ্রামে পড়ে থেকে না খেয়ে ছেঁড়া জামা কাপড় পরে মশার কামড় খেতে চায় না, এখন তাদের একটাই চিন্তা, বিদেশ পাড়ি।

যে গ্রামে ঘরবাড়ি নেই, খাবার নেই, জল নেই, শোওয়ার বিছানা নেই, নির্দিষ্ট পায়খানা নেই, স্কুল নেই, ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই, স্কুল নেই, কাজ নেই, আছে মশা, নোনা জল, বিষধর সাপ আর দুর্গন্ধ, সেখানে কি মানুষ থাকতে পারে? সেই নাপিতখালি গ্রাম কি জীবের বসবাসের যোগ্য? জানি না এ ঝড় কোনদিন থামবে কি না! পৃথিবী আবার শান্ত হবে কি না!

প্রথম পাতার পর... রাজারহাট

• গত ২০.১০.২০০৯ তারিখ নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে ভারতের সমস্ত রাজ্যের পুর মন্ত্রীদের সম্মেলন থেকে ঘোষিত নতুন নীতি অনুযায়ী জমিহারাদের প্রকল্প শেষ হওয়ার পর নির্ধারিত মূল্যের বাকি অংশ পুনরায় দিতে হবে।

• বেদিক ভিলেজ, অলিভ গার্ডেন, হদোরাইট মৌজায় কেডিসি বা রাজারহাট এলাকায় খাস জমি পুনরুদ্ধার করে ভূমিহারা, খেতমজুরদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। অনিচ্ছুক কৃষকদের বেআইনিভাবে দখল করা জমি ফেরত দিতে হবে।

• যেসব জমির চরিত্র বদল হয়নি ও চাষের উপযোগী আছে, তা চাষের জন্য পুনরায় সেচ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

• জগদীশপুর সহ অন্যান্য মৌজায় দালালদের সাজানো মালিকের দ্বারা ভুয়ো রেজিস্ট্রিকৃত জমি দখলের জন্য পুলিশ ও দালালদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে।

• ২০০৫ সালের জমি আন্দোলনে যুক্ত পাথরঘাটার সাতজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা নিঃশর্তে প্রত্যাহার করতে হবে।

• রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করে এবং রাজারহাটের অস্ত্র ভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করে সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

এখনও বন্ধ পাহাড়পুর, শ্রমিকরা কোম্পানির মুখ চেয়ে বসে আছে

পার্থ কয়াল, পাহাড়পুর কুলিং টাওয়ার্স, ভাসা ওয়ার্কস–এর গেট •

১৪ আগস্ট

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। ১৪৪ ধারা জারির পর থেকে শ্রমিকরা আর কারখানার গেটে ভিড় করে না। আইন মোতাবেক কারখানার গেট ছেড়ে রাস্তার ওপর নয়ানজুলিতে যে বাঁশের মাচা তৈরি হয়েছে, সেখানে অনেকে বসে তাস খেলছে। এখন প্রায় ছ'টা সওয়া ছ'টা বাজে। এর আগে একদিন এখানে এসেছিলাম দুপুরবেলা। এক সপ্তাহ আগে। দুপুর তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ। কারখানার গেট এবং ক্যাম্প পুরো ফাঁকা। কেউ নেই। আগে যে দেখা যেত, শ্রমিকরা আসছে, কারখানা কবে খুলবে কি খুলবে না, সে বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছে, সে সব আর নেই। উল্টোদিকে মন্টুর সাইকেলের দোকান। সেদিন ওখানে খোঁজ করতে মন্টু বলেছিল, সবারই তো পেটভাতানির ব্যাপার আছে। কারখানা বন্ধ থাকলে কতদিন আর কারখানার গেটে পড়ে থাকতে পারে? তা আজকে বেলায় এসেছি। সন্ধ্যের দিকে। দুটো গ্রুপ করে তাস খেলা চলছে। তলায় বাঁশের বাখারির ফাঁক গলে তাস যাতে পড়ে না যায়, তার বন্দোবস্ত হয়েছে। বোর্ডের মধ্যে 'পাহাড়পুরের বেআইনি সাসপেনশন অব ওয়ার্ক মানছি না মানব না', 'অবিলম্বে কারখানা খুলতে হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি বয়ান সম্বলিত লাল কালিতে লেখা পোস্টারগুলি পেতে, তার ওপর তাসের দান পড়ছে। সন্ধ্যা হতে যাচ্ছে, আশপাশের কারখানায় যারা কাজে ঢুকেছে, এ কারখানার কাজ চলে যাওয়ার পর, তারা সবাই জড়ো হয়েছে, ঠিক যেখানে তাস খেলা হচ্ছে, সেখানে এগিয়ে গেলাম। দু'তিনজন বলে উঠলেন, 'ওই নেতা ওদিকে।' আমাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আর একজন বললেন, নেতা এখন স্লো মুভমেন্ট করছে। অন্য দু'তিনজন হালকা হাসিতে সাপোর্ট দিলেন। যেদিকে নেতা আছে, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। নেতা বলতে শ্রীকান্ত নস্কর। না, নেই। ১৫ আগস্টের জন্য ফ্ল্যাগ কিনতে বেড়িয়েছেন। অন্য দু–চারজন ব'সে। কেউ আসছে বা কেউ যাচ্ছে। কেউ বা পাশের কারখানায় কাজ করে কিছু পয়সা পেয়েছে। কেউ কেউ তাতে চোলাই খাওয়ার তাল করছে। ওখানে বসলাম। একজন শ্রমিক বললেন, 'আসলে টিএমসি–কে তো কেউ সহ্যই করতে পারছে না। কোম্পানিও তাই। এর আগেরটার সাথে একরকম বোঝাপড়া ছিল। এখানে তো তা চলবে না।'

কেউ ভাবছে কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করবে

প্রথমে ধারণা হয়েছিল, ১৫ আগস্টের আগের দিন বলেই এত শ্রমিক। পরে বুঝলাম, তা নয়। আজ শ্রম দপ্তরে একটা মিটিং ছিল। তাই পুজোর আগে খোলে কিনা, তার খোঁজেই সবাই এসেছিল। কেউই সঠিক বলতে পারল না, শ্রম দপ্তরে ঠিক কী হল। তবে আগে যে অল্পবয়সী ছেলেরা একদম কারখানার গেট আগলে পড়ে থাকত, তারা কেউই নেই। কারখানার গেট থেকে মাল বেরিয়ে গেছে। তাই সম্ভবত শ্রমিকরা ধারণা করেছে, কারখানা আর নাও খুলতে পারে। আগে যেমন পাহাড়পুরের ভাসা ওয়ার্কস বিক্রি হয়ে যেতে পারে, একথা শ্রমিকরা হাত নেড়ে উড়িয়েই দিয়েছিল, এখন আর তা নয়, বিক্রি হলেও হতে পারে, এরকম মতই প্রকাশ্যে আসছে। 'ওর বাড়ি, ওর জমি, ওর কলকব্জা — আমাদের বকেয়া মিটিয়ে দিয়ে তো যেতেই হবে।' একজন মন্তব্য করল। আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে রাস্তার অপর পারে গেলাম। সোমনাথ বছর পঁচিশের একজন শ্রমিক। রাস্তার অপর পারে দাঁড়িয়ে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির একজনের সাথে তিনি কথা বলছেন। আগে শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির সাথে কেউই কথা বলত না। এখন দু–তিনজন শ্রমিক ঘিরে দাঁড়িয়ে। একটা লিফলেট বিলোনো হচ্ছে। এপারের ক্যাম্প থেকে অনেকে দেখল। তাস খেলা চলছে। সোমনাথ কয়েকটি লিফলেট নিয়ে এপারে এল। ওতে কী বলছে, মামলা করতে হবে, সে তো চাঁদা তুলে মামলা করলেই হয়, এসব বললেও, মামলা করা যুক্তিযুক্ত কিনা তা নিয়ে বিচারে বসল। লিফলেটটা কিন্তু কোনও শ্রমিক হাতে নিয়ে দেখল না।

২৩ সেপ্টেম্বর

'যা কিছু হবে সব মিলেই করতে হবে'

আজ পঞ্চমী। সন্ধ্যেবেলায় পাহাড়পুরের ভাসার গেট থেকে দূরের ক্যাম্পে কয়েকজন ওয়ার্কার বসে আছে। তাস খেলায় কোনও উৎসাহ দেখাচ্ছে না। আলোচনা হচ্ছে, কারখানা খুলবে কি খুলবে না। 'আপনাদের কারখানা এখনও খুলল না?' প্রশ্ন করতে প্রত্যুত্তর পেলাম, 'ফাঁদে পা দিয়েছ। এত সহজে ফাঁদ কেটে বেরোনো যাবে?' বড়ো জোর চারজন বসে আছে। ওই সেই বাঁশের মাচার ক্যাম্প। সামনে দিয়ে বাস লরির আলো আর হর্নের শব্দ, হঠাৎই আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়পুর কুলিং টাওয়ার্সের নিস্তব্ধ বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে আছে। 'তোমরা বলছিলে জোরদার লড়াই চাই, নেতাও তাই লড়াই করছে।' অনেকটা স্বগতোক্তি। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হল সাথে সাথে। 'শ্রমিকরা তো লড়াই করতেই চেয়েছিল। অন্তত রাস্তা বন্ধ করা গেল না?' 'রাস্তা বন্ধ যে করবে, তা কাকে নিয়ে করবে? তোমরা বলছো লড়াই করবে, অথচ যে যার মতো ম্যানেজমেন্ট বা বাবুদের ধরছ। আরে রাস্তা অবরোধ করবে না। ঝামেলা হবে না। মারপিট হবে না। এভাবে হয়? সব ইউনিয়নগিরি করছে। আজ টিএমসি ভাল, তোমরাই তো বলে ইউনিয়ন তৈরি করলে। আর আজ এইসব কথা বলছ কেন?' — এরকম কথার পিঠে কথার পরত চাপা পড়ে। সবাই মিলে তর্ক করে উচ্চগ্রামে। আবার গলা খাদে নেমে আসে। 'না, আর ওই কোর্ট কাছারি করে কিছু হবে না। এ কোম্পানিকে শালা বলে নয়, দাদা বলে যা হয় কিছু করতে হবে। যা কিছু হবে সব মিলেই করতে হবে।'

ভারা বেঁধে বিল্ডিং রঙ করছেন কেউ পাশের কোম্পানিতে

সন্ধ্যা ছ'টা তিরিশ বেজে গেছে। আজ পঞ্চমী। কলকাতার মণ্ডপগুলিতে পুজোর উদ্বোধন। একজন শ্রমিক পাশের একটি কারখানার কাজের শিফ্‌ট থেকে ক্যাম্পে এসে বসলেন। বস্তা বওয়ার কাজ করছেন। 'পিঠে কড়া পড়ে গেল'। পাহাড়পুরে ফ্লোটিং লেবার হিসেবে কাজ করেছেন। এখন যেখানে কাজ করছেন, কন্ট্রাক্টরের অধীন। একমাস কাজ পুরো হয়নি। অপেক্ষা করছেন কারখানা খোলার। অবশেষে সেপ্টেম্বরে কাজে ঢুকেছেন। মাইনে হতে দেরি। নতুন কোম্পানির নিয়ম হল, যারা তিন বছরের পুরনো, তাদের সাত তারিখে বেতন হবে, দু'বছরের পুরনোদের বারো তারিখে, আর নতুনদের আরও দেরিতে। পঞ্চাশের ঊর্ধে বয়স, একজন ফ্লোটিং লেবার এসে বসলেন, এসেই ক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এ বয়সে আর পাঁচতলার কাজ পোষায়?' স্বগতোক্তিটা সবার কানে গেল। একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, লিফট চালাচ্ছ নাকি?' অন্যরা সমস্বরে হেসে উঠলেন। কারণ, এত বয়সে ভারা বেঁধে বিল্ডিং রঙ করার কাজ করছেন।

কেউ বা জমির দালালি...

আর একজন বললেন, 'মাঝে একটা কোম্পানি টাওয়ারের জায়গা খুঁজতে আসে। তখন সবে পাহাড়পুর বন্ধ হয়েছে। আমি জায়গা দেওয়ার জন্য একজনকে রাজি করালাম। কোম্পানি দেবে দু'লাখ, যে জায়গা দেবে, তাকে বললাম দেড় লাখ। আর মোবাইল টাওয়ার দেখাশোনার কাজ আছে। ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা কমিশন আসত। কিন্তু এই পাহাড়পুরের ঝামেলায় সেও গেল'। ইতিমধ্যে একজন বাইকে করে এসে খবর নিলেন, শ্রীকান্ত কোথায়? সে চলে যাওয়ার পর জানা গেল, ওই ব্যক্তিটি পাহাড়পুরে ওয়েল্ডারের কাজ করতেন। কারখানা চালু থাকা অবস্থায় টানা চারদিন ডিউটি দিয়ে তিনদিন অন্যত্র খেপ খাটতেন। বাড়িতে অন্য লেবার দিয়ে কন্ট্রাক্টের কাজও করান। তাই ডিউটির ফাঁকে সেখানেও দেখভাল করতে যেতে হত।

অর্ডার হাতছাড়া হচ্ছে, ভাসা খোলার জন্য চাপ বাড়ছে কোম্পানির ওপর

পাহাড়পুর কুলিং টাওয়ার্সের সাম্প্রতিকতম খবর হল, গুরু নানক অয়েল রিফাইনারির জন্য ছেচল্লিশটা হিট এক্সচেঞ্জার তৈরির অর্ডার হাতছাড়া হয়েছে। কারণ পাহাড়পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, ওইগুলি সাইবারাবাদের কারখানায় তৈরি হবে, কিন্তু ইআইএল কর্তৃপক্ষ যারা ওই অয়েল রিফাইনারির তরফে এই বিষয়টা ডিল করছে, তারা রাজি হয়নি। তাদের বক্তব্য, ভাসা ছাড়া অন্য কোথাওই এই ধরনের কাজের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আরও একটা ঘটনা হল, একটা বিদেশি কোম্পানি এ মাসের পাঁচ–ছ' তারিখে এসে পাহাড়পুর ভাসা ওয়ার্কস ঘুরে গেছে। পাহাড়পুর কর্তৃপক্ষ তাদের জানিয়েছে, ওই দু'দিন কারখানায় ছুটি। এর মধ্যেই পাহাড়পুরের মেন অফিসে ৯০০১:২০০৮–এর প্রশিক্ষণ চলছে। সেখানে প্রডাক্ট সিকিউরিটির কথা আছে, ভেন্ডার ডেভেলপমেন্টের কথা আছে, কিন্তু লেবার সিকিউরিটির কোনও কথা নেই। পাহাড়পুরে যখন ওয়ার্ক সাসপেনশন নোটিশ জারি করা হয়, তখন থেকে যে চারজন পার্মানেন্ট ওয়ার্কারের বিরুদ্ধে কোম্পানি নোটিশ জারি করেছিল, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে, তাদের সবাই কোম্পানির ডোমেস্টিক কোর্টে সারেন্ডার করেছে। তিনজন ইতিমধ্যে ভিআরএস নিয়ে কোম্পানি ছেড়েও দিয়েছে। যদিও কোম্পানি কিন্তু একইসঙ্গে মে মাসের বকেয়া বেতন কোনও ওয়ার্কারকেই দেয় নি। কারণ মে মাসের বকেয়া বেতন দেওয়ার কথা ছিল জুন মাসের সাত তারিখে। ছ' তারিখ থেকে কোম্পানিতে সাসপেনশন অব ওয়ার্ক জারি হয়।

আইলা এবং সুন্দরবন

আলোচনা করবেন সুজিত চৌধুরী। ভূতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোন থেকে।

৮ নভেম্বর ২০০৯ রবিবার দুপুর একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত। ঠিকানা, ১৬৬সি রায়পুর রোড (রায়পুর লেটার বক্সের কাছে), কোলকাতা ৪৭, ফোন নং ৯৪৩৩৪৪৫২২৪, ৯৮৩১০৬১৪৫৫। আয়োজনে সুন্দরবনবাসীর সাথে।

ইচ্ছুকরা চলে আসুন, পারলে পৌনে একটার মধ্যে!

শিক্ষামূলক ভ্রমণে ভুটান (১)

বশিরুদ্দিন, ২২ অক্টোবর •

গত ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিশ্বভারতীর ইন্দো–টিবেটান ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ হয়ে গেল। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণে আমরা মোট ২১ জন গিয়েছিলাম ভুটান। এর মধ্যে একজন ছাত্র আমেরিকার, একজন কানাডার। বিভাগীয় প্রধান অস্ট্রিয়ান। এছাড়া একজন প্রফেসর, একজন পার্ট টাইম শিক্ষক এবং আমাদের বিভাগীয় প্রধানের ড্রাইভার ছিলেন।

ডিপার্টমেন্টে প্রতি বছর একটা শিক্ষামূলক ভ্রমণ হয়। এ বছর প্রথম থেকেই ঠিক ছিল, ভুটান যাওয়া হবে। যদিও এই ভ্রমণের সময় জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি বা মার্চ, শুধুমাত্র বিভাগীয় প্রধান আন্দ্রেয়া রোজারিস–এর চেষ্টায় এত আগে এটা সম্ভব হল। শান্তিনিকেতনের অন্যতম উৎসব বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ। এই উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, ভুটানের কনসাল জেনারেল হেরিং ওয়াংদা। আন্দ্রেয়াদি সেখানে কথা বলার সুযোগ পান এবং ঠিক হয়ে যায় তারিখ। জানতে পারি যে আমরা এমনি যাচ্ছি না, রয়াল গভর্নমেন্টের অতিথি হয়ে আমরা যাচ্ছি। থাকা ও গাড়ি করে ঘোরানোর দায়িত্ব রয়াল গভর্নমেন্টের। শুধু খাওয়া খরচ আমাদের। ফলে অনেকটা করে খরচ সকলের বেঁচে যায়। যদিও আমাকে আন্দ্রেয়াদি ডিপার্টমেন্টের কাজের বিনিময়ে খানিকটা অর্থসাহায্য করেছিলেন। নাহলে তো যেতে পারতাম না। এই প্রথম দেশের বাইরে যাওয়া মোটেই হাতছাড়া করতে চাই নি। তবে আমি বলেছিলাম, এই সফরটা দুদিন এগিয়ে নিয়ে আসা হোক, কারণ, সামনে ঈদ। কিন্তু আমি একাই (মুসলিম) ছিলাম, তাই আমার কথা তেমন গুরুত্ব পায়নি।

যাই হোক ১৪ তারিখ রাত্রি সাড়ে বারোটায় বোলপুর স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপলাম। সকাল সাড়ে আটটায় নামলাম এনজিপি স্টেশনে। এখান থেকে বাসে করে যাওয়া। তিস্তা–তোর্সা নদী, যে নদীগুলোর নাম ভূগোলে পড়েছিলাম, সেগুলো দেখতে দেখতে। মাঝপথে জলপাইগুড়ির চা বাগান। কী মনোরম দৃশ্য। এই প্রথম চা বাগান দেখলাম। আনন্দে আত্মহারা শুধু আমি না, সকল ছাত্রছাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার জয়গাঁতে সীমানা, এবং এখান থেকেই ভুটান শুরু। শুরুতেই পড়ছে ফুন্টসলিং এবং এই ফুন্টসলিং–এই আমরা বিকেল তিনটে নাগাদ পৌঁছাই। রাতটা ফুন্টসলিং–এ ওয়াইডিএফ ইয়ুথ হস্টেলে চারতলা বিল্ডিংয়ে থাকার ব্যবস্থা। এটি রয়াল গভর্নমেন্টের রিজিওনাল এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এবং মিনিস্ট্রি অফ লেবার–এর অফিস। এটি চুখা জেলার অধীন। সকাল ন'টায় আমাদের যাত্রা শুরু হবার কথা, থিম্পুর উদ্দেশ্যে। এখান থেকে থিম্পু একশ বাহান্ন কিলোমিটার। কিন্তু একজন স্যার ও দুজন ছাত্রছাত্রী, দুজন বিদেশি ছাত্রর ভিসা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। তাদের কোনও ভোটার আই কার্ড ছিল না। ভিসা সমস্যা মিটিয়ে ওরা যখন ফিরে এল, তখন বেলা এগারোটা পেরিয়ে গেছে।

রয়াল গভর্নমেন্ট যে বাসটি আমাদের দিয়েছিল, সেই বাসে কুড়ি জনের বেশি চাপা যাবে না, পাহাড়ি রাস্তায়। ফলে অন্য গাড়িতে দু'জনকে যেতে হল। কেউ সঙ্গ ছেড়ে যেতে চাইল না। কারণ একসঙ্গে যাওয়ার মজাই আলাদা। একসঙ্গে গান করা বা হাসাহাসি ছেড়ে যাওয়া যায়? অগত্যা আমি আর অন্য একজন পার্ট টাইমার স্যার মনোতোষদা, দু'জনে গেলাম। আমাদের গাড়িটি আগে আগে যেতে শুরু করল। শুরু হল পাহাড়ি রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া।

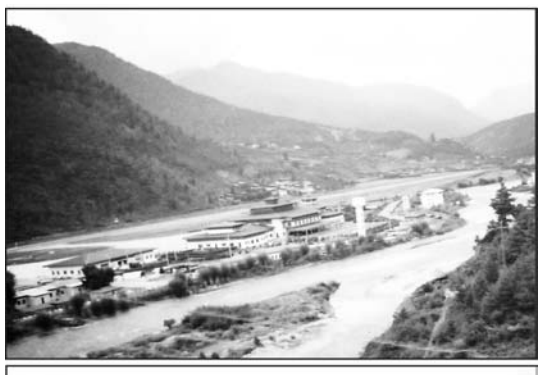

শুরুতেই চেকপোস্টে চেক হল। থিম্পু যাওয়ার পথে মোট তিনটি চেকপোস্টে আমাদের চেক করেছে। পাহাড়ি রাস্তা। পাহাড় ঘুরে ঘুরে যেতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন একই জায়গায় আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। বাঁদিকে ভীষণ খাদ। তাকাতেই ভয় করে। অবশ্য দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হতে থাকে, আর যেন চোখের দেখা বিশ্বাস করতে পারছি না। যেন স্বপ্ন দেখছি। রূপকথার গল্পের দেশে ভাসছি। আমাদের মাঠে যেমন ধানগাছে সারা মাঠ সবুজে ভরে থাকে, আবার ধান পাকার সময় যেমন সোনারঙে ভরে ওঠে গোটা মাঠ, ঠিক তেমনই অপূর্ব এই দৃশ্য। পাহাড়ের ঢালে যেন প্রকৃতিকে ছড়িয়ে দিয়েছে বা কেউ যেন গেঁথে সাজিয়ে দিয়েছে।

আমরা ছোটো গাড়িতে ড্রাইভারকে নিয়ে পাঁচজন ছিলাম। রয়াল গভর্নমেন্ট থেকে একজন দিদি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, গাইড করার জন্য। তিনি, তাঁর মা এবং আমরা দু'জন। আমরা সেই গাড়ি নিয়ে বাসের আগে আগে যেতে লাগলাম। পথে রামট্যাক নামে একটা হোটেলে আমাদের লাঞ্চ করার কথা ছিল। আড়াইটে বাজে। আমরা আগে পৌঁছে গিয়েছি। আধঘন্টা পরে এল বাস। বাস থেকে কয়েকজন নামল, যারা এর মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জনা চারপাঁচ বমি করেছে পাহাড়ি রাস্তার কারণে।

লাঞ্চ করে আবার যখন যাত্রা শুরু করলাম, তখন সাড়ে তিনটে বাজে। এবং এখনও একশো কিলোমিটার বাকি আছে এখান থেকে। এখানে আমাকে বাসে তুলে দিয়ে আর একজন স্যার আমার বদলে ওই ছোটোগাড়িতে উঠলেন। এবার বেশ ঠান্ডা অনুভব করতে লাগলাম। সমস্ত শীতবস্ত্র বাসের ছাদে থাকায় তা নামাতে হল এবং পরতে হল। রাস্তা আর শেষ হয় না। গাড়ির গতি খুব কম। একই রাস্তায় একদিকে যাওয়া, একদিকে আসা। এটাই হাইওয়ে। এই রাস্তায় কোনরকমে দুটো গাড়ি যেতে পারে। কোনও কোনও জায়গা আছে, যেখানে পাশাপাশি দুটো গাড়িও পাস হবে না। তবে রাস্তাগুলো বেশ ঝকঝকে। শুনলাম ভারতীয়রাই টেন্ডার নিয়ে এদেশে রাস্তা তৈরির কাজ করে করে। এখানে তারা কোনও ফাঁকিবাজি করতে পারে না। অথচ তারাই নিজের দেশে ফাঁকি দিয়ে কাজ করে। আরও আশ্চর্য হলাম, এতদূর রাস্তায় এলাম, কোনও হর্ন শুনিনি। এত বাঁক, এত ঘুরপথ, তবু কোনও হর্ন দরকার হয় না। সবাই নিজের সাইডে যাতায়াত করছে। রাস্তায় গাড়িও অবশ্য কম। পাঁচটা বাজতেই ঘোর অন্ধকার নেমে আসছে পাহাড়ের গায়ে। সূর্য আড়াল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে চোরাবালির মতো পাহাড়ের শীর্ষে দেখা গেছে সূর্যকে। সন্ধ্যে হতেই ঘোর অন্ধকার, বাসের আলো ছাড়া কিছু নেই। ভয়ও লাগছে, খাদে না পড়ে যাই। তবে ড্রাইভার বেশ অভিজ্ঞ।

রাস্তার আলো দেখে বুঝলাম, থিম্পু এসে গেছি। শহরের ভেতর দিয়ে দু' কিলোমিটার গিয়ে পৌঁছলাম আমাদের ঠিকানায়। রাতে শহরটি বেশ ঝকঝকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগছিল। এবং আমাদের দেশের শহরগুলোর মতো এখানে সুউচ্চ বাড়ি নেই। বেশিরভাগ দুতলা। তিনতলা এক আধটা আছে। শহরটি কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, যেন চড়াই উতরাইয়ের মতো অবস্থান করছে। যাই হোক, পৌনে আটটা নাগাদ আমরা থিম্পু পৌঁছলাম। ডিপার্টমেন্ট অফ স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়ুথ–এর হোস্টেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। (ছবি লেখকের সৌজন্যে) *ক্রমশ*

খ ব রে দু নি য়া

পেশোয়ারের জঘন্য গণহত্যায় জড়িয়েছে তালিবান এবং মার্কিন কর্পোরেট ব্ল্যাকওয়াটারের নাম

শমীক সরকার, ৩১ অক্টোবর •

পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের রাজধানী পেশোয়ারের মিনা বাজারে ২৮ অক্টোবরে গাড়ি বোমা ফেটে মৃত্যুর সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে। আহত অনেক।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম পুরনো শহর পেশোয়ার। ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ফৌজ আফগানিস্তান আক্রমণ করলে লক্ষ লক্ষ আফগান সীমান্ত লাগোয়া পাকিস্তানে চলে আসে। পেশোয়ার হয়ে ওঠে আফগান সংস্কৃতির কেন্দ্র। পাশতু এবং দারি সঙ্গীত, সিনেমা এবং বইয়ে ভরে ওঠে পেশোয়ার। ২০০২ সালে ইসলামিক মৌলবাদী জোট নির্বাচনে জিতে এই শহরে প্রকাশ্যে সঙ্গীত প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে দেয়।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ এই গণহত্যার জন্য দায়ী করেছে তালিবানকে। অপরদিকে পাকিস্তানি তালিবানদের নেতা হাকিমুল্লা মেহসুদ এর দায় অস্বীকার করেছেন, কারণ তালিবানরা পাকিস্তানি সেনার সাথে লড়ছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে নয়। তাঁর মতে, এই হত্যাকান্ডের পেছনে রয়েছে মার্কিন ভাড়াটে সেনাদের কোম্পানি ব্ল্যাকওয়াটার। সঙ্গের ছবিতে এবছর ঈদের আগের ব্যস্ত মিনা বাজার।

রাস্তা না মৃত্যু ফাঁদ?

সঞ্জয় ঘোষ, জয়নগর–মজিলপুর, ২১ অক্টোবর •

জয়নগর থানা অঞ্চলের মধ্যে উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েতের অধীন জয়নগর–মজিলপুর পুরসভাভুক্ত অঞ্চল থেকে মাত্র তিন চার মিনিট দূরত্বে বিলপাড়া মোল্লাপাড়ায় এর অবস্থান। বিশ্বাস করতে সত্যি কষ্ট হয় যে পুরসভা অঞ্চলের এত কাছে এরকম চরম খারাপ জায়গা থাকতে পারে। মোল্লার পুকুর আর গাজির পুকুর নামে দুটো পুকুরের মাঝখানে ১২ থেকে ১৫ বছর ধরে নাকি এই মৃত্যুফাঁদ রয়েছে বলে স্থানীয় মানুষ বলছে। পুকুরের শেষ প্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে মন্দিরবাজার থানার অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েতের অঞ্চল। ফলে কেউই নিজের দায়িত্ব স্বীকার করছে না। চরম ভোগান্তি হচ্ছে স্থানীয় মানুষের। এখানকার লোকেরাই কোনরকমে গাছের গুঁড়ি ফেলে পারাপারের একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছে। বর্ষাকালে এটা একফুট জলের নিচে থাকে। অথচ প্রতিদিন এখান দিয়ে শত শত লোককে যাতায়াত করতে হয়। এটা ১০০ শতাংশ মুসলিম বসতির এলাকা। আগে বামফ্রন্টের আরএসপি সদস্য পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। নির্বাচনের ৬ মাস আগে ওই মহিলা সদস্যের মৃত্যু হয়। অবিলম্বে এখানে ভালো পাকা রাস্তা হোক, এটাই সব মানুষের দাবি।

কাছাকাছি মোল্লাপাড়ায় বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েতেও নিকাশি ব্যবস্থা নেই ও রাস্তা খুবই খারাপ। বর্ষায় এক–দেড় ফুট জল জমে যায় সেখানে। এখানকার আশি শতাংশ মানুষ পার্ক সার্কাসে চামড়ার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, বিশেষত যুবকেরা, জানালেন অলি ঘরামি (৩৫)। ওঁর বৌদি আলেমা ঘরামি এই প্রথমবার এই বুথ থেকে পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন টিএমসি–র পক্ষ থেকে। অলি চার বিঘা জমি নিয়েছেন আগাম টাকায় চাষ করার জন্য। প্রতি বিঘায় এক হাজার টাকা খরচ বর্ষার চাষে। আর খোরোর চাষে চার হাজার করে ষোল হাজার খরচ। এর থেকে সারা বছরের খোরাকি হয়ে যায়। ভালো ফসল হলে তবে বিক্রি করতে পারেন। আলেমার স্বামী শিয়ালদাতে সবজি বিক্রি করেন হাট থেকে কিনে। মাটির বাড়ি একটু উঁচু, উঠেই ঢাঢা ঘর। জরির কাজও করেন সদস্যা। রাস্তার ওপরে এনার একটা দোকানও আছে দেখলাম। সম্ভবত চা বিস্কুটের বা মুদির। অলি বললেন, এখানকার ২৫ শতাংশ মানুষের জমি আছে, বাকিদের নেই। যাদের নেই, তারা চামড়ার কারখানায় কাজে যায়। ১৫০০ থেকে ৩৫০০ টাকা মাইনে পায়। নিমপিঠেও কেউ কেউ কাজ করে। ওখানে সুগার বিট কারখানাটা চলছিল না, তাই পার্ক সার্কাসের মালিক ওটাকে কিনে নিয়ে ব্যাগ ইত্যাদি চামড়ার জিনিস তৈরির কারখানা করেছে। আলেমাও দুবিঘা জমিতে আগাম টাকায় চাষ করেন।

অলি আরও জানালেন, ওঁদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র মাধবপুরের নাইয়ার হাটে। ওখানে জলের ব্যবস্থা নেই। বসার জায়গা নেই। মাঠের মধ্যিখানে। কাছে ওষুধ কেনার সুযোগ নেই। কিনতে গেলে অনেক দূরে লক্ষ্মীকান্তপুরে আসতে হয়। ওরা তাই নিমপিঠে যায়। নাইয়ার হাটে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে গেলে গরু মুরগি হাঁস বন্ধক রেখে যেতে হয় এই বিলপাড়া, গাজিপাড়া থেকে।

লাঞ্ছিত লালগড়

একটি রক্তাক্ত দলিল

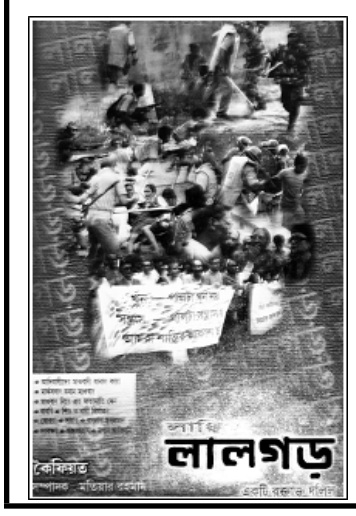

প্রথিতযশা লেখক–লেখিকা, সমাজসেবী, সাংবাদিকদের যেসব লেখায় বইটি সমৃদ্ধ —

মহাশ্বেতা দেবী, তপন সিনহা, শাঁওলি মিত্র, সুমিত চৌধুরী, পল্লব কীর্তনীয়া, মীরাতুন নাহার, সুকুমার মিত্র, সুমন চট্টোপাধ্যায়, কুমার রানা, ভবানী চট্টোপাধ্যায়, সুজাত ভদ্র, সৌমিত্র দস্তিদার, সারদাপ্রসাদ কিস্কু, মেধা পাটেকর, শাশ্বতী ঘোষ, ড. কমল রায়, সেখ সদর আলি, মণীষা ব্যানার্জি, অসীম গিরি এবং আরও অনেকে ...

প্রাপ্তিস্থান : বাকচর্চা। ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯
মো : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১/৯৮৩৬১৮২৩০৭

ছ·ভ্র জনতার আদালত

পত্রিকা–বিক্রেতাদের কাছেও পাওয়া যাচ্ছে।
মো : ৯৯৩৩০৯৫৪০৫

আকর্ষণীয় বহুবর্ণ প্রচ্ছদ, ম্যাপলিথো কাগজে ঝকঝকে ছাপা, হার্ডবোর্ড বাঁধাই ০ ১১০ টাকা

গার্লস মাদ্রাসায় পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে কাজিয়া

মহব্বত হোসেন, আকড়া মহেশতলা, ২৯ অক্টোবর •

গত সোমবার বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ আকড়া গার্লস মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল চরমে ওঠে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই মাদ্রাসার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এক–দেড়শ অভিভাবক এবং স্থানীয় কিছু বাসিন্দা এতে শামিল হয়। এদের দাবি ছিল, গার্লস মাদ্রাসায় পুরুষ শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

খবরে প্রকাশ, আকড়া গার্লস মাদ্রাসায় শিক্ষক ও শিক্ষিকা মিলিয়ে ৭ জনকে নিয়োগ করার জন্য 'মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন' বিবেচনা করেছিল। এর মধ্যে ৩ জন মহিলা এবং ৪ জন পুরুষ। এই পুরুষ শিক্ষকদের নিয়োগ নিয়েই বিরোধ। গত ২৩ অক্টোবর মাদ্রাসার বর্তমান সেক্রেটারি সাইফুদ্দিন মোল্লা মহেশতলা পৌরসভায় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের অভিভাবকদের মিটিং ডাকেন। ওই সভায় ৫০–৬০ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে আলোচনার সময় অধিকাংশ অভিভাবক সম্মতি দেন। কিছু অভিভাবক অবশ্য প্রশ্ন তোলেন, 'গার্লস স্কুলে পুরুষ শিক্ষক কেন? এলাকার কোন গার্লস স্কুলে তো কোন পুরুষ শিক্ষক নেই। তাহলে এখানে কেন?' প্রধান শিক্ষিকা পারভিন আঞ্জুমান বানু তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন, কোন পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তিনি বলেন, 'আমরা সায়েন্স সাবজেক্টে কোন মুসলমান মহিলা টিচার পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে পুরুষ টিচার নিতে হচ্ছে।' তখন সকলে তা মেনে নেন এবং মাদ্রাসার সম্পাদক ও সভাপতিও ওই সভায় এতে সম্মতি দেন।

এরপর দুয়ের পাতায়

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯
মঙ্গলবার দুপুর তিনটে থেকে সন্ধ্যে সাতটা
ও শনিবার দুপুর দু'টো থেকে সন্ধ্যে ছ'টা
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, অফিসে যোগাযোগের চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১ (মঙ্গলবার) এবং ৯৮৩০৭৪৬১৯৬ (শনিবার)
ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
প্রতি মাসের ১ ও ১৬ তারিখ সংবাদমন্থন প্রকাশিত হচ্ছে। ২ টাকার বিনিময়ে আপনার নিকটবর্তী স্টল বা কাগজবিক্রেতার কাছ থেকে সংগ্রহ করুন।
সারা বছর ডাকযোগে পাওয়ার জন্য গ্রাহক হ'ন। গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্টঅফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi, B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18.